ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন

*ড. মোঃ আবুল হাসনাত

সারসংক্ষেপঃ বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই সোচ্চার ছিল। ১৯৪৮ সালে গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিমলীগের মেনিফেস্টোতেও স্বায়ত্তশাসনের জোরালো দাবি উপস্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম দুর্বার প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আবারো সামনে আসে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কাল বাঙালি জাতির ইতিহাসে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। কেননা, এই সময়কালের পুরোটা জুড়েই স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বাঙালিকে সর্বদা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যেই থাকতে হয়েছে। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ২১ দফা, ৫৬'র সংবিধান বিরোধী আন্দোলন, ৫৮'র সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬২'র ছাত্র আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ৭০'র নির্বাচন ও সর্বশেষ ৭১'এর স্বাধীনতা আন্দোলন সবই ছিল বাঙালি জাতির চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের যে সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭১ সালে এসে তা স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে। বাঙালি জাতিসত্তা ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিকাশপর্বের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

হাজার বছরের বীরত্বগাঁথা কালজয়ী যোদ্ধা জাতি বাঙালীর সংগ্রাম মুখরতা ইতিহাসে অনবদ্য এক জায়গা দখল করে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ বা সশস্ত্র প্রতিরোধের সময়টা বেশ দীর্ঘ। সময়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম হলেও এই সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠার পূর্বে যে দীর্ঘ গণ-আন্দোলনের ইতিহাস থাকে তার সাথে আমাদের দেশ ও জাতির অভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস কেবল ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এই নয় মাসের যুদ্ধের ইতিহাস নয়। এই যুদ্ধের পূর্বে তেইশ বৎসরব্যাপী যে সংগ্রামের ইতিহাস, আন্দোলনের ইতিহাস আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই দীর্ঘ আন্দোলনের ইতিহাস স্বায়ত্তশাসন থেকে যে গণ-আন্দোলনে রূপ নেয় তারই চূড়ান্ত বহিঃ প্রকাশ স্বাধীনতা আন্দোলন।[১]

রক্তঝরা বাঙালি জাতির করুন ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অগ্রদূত মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণে। "আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের করুণ ইতিহাস মুমুর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।"[২]

* প্রভাষক, আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ দু'শো বছর বৃটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ-ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেন সে অনুসারে স্বাধীন সার্বভৌম এক অখণ্ড বাংলা গঠনের সুযোগ ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হাইকম্যান্ডের চক্রান্তে অখণ্ড বাংলা গঠনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ধর্মীয় ভিত্তিতে বাংলাকে ভাগ করা হয়: মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলা পাকিস্তানভূক্ত এবং হিন্দু প্রধান পশ্চিমবাংলা ভারতভুক্ত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা-ভূখণ্ডকে দুই অংশে বিভক্ত করা হলেও বাংলার কোনো অংশই নির্ভেজালভাবে হিন্দুর কিংবা মুসলমানের বাংলা হতে পারেনি। ১৯৪৭-এ ২৫.০১% মুসলমান পশ্চিমবাংলাভুক্ত এবং ২৯-১৭% হিন্দু পূর্ববাংলাভুক্ত থাকে। বাংলাভাগের পর যদিও কয়েক লক্ষ হিন্দু-মুসলমান এক বাংলা ত্যাগ করে অন্য বাংলায় গেছে কিন্তু তারপরেও অসংখ্য মুসলমান বাঙালি পশ্চিমবাংলায় থেকে যায় এবং অনুরূপভাবে অনেক হিন্দুও পূর্ববাংলায় অবস্থান করে।

বাংলা বিভক্তি আসলে কংগ্রেস ও মুসলিম হাই কম্যান্ড-এর একটা চক্রান্ত ছিল। বাংলাকে বিভক্ত করে শোষণ করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাই তো দেখা যায় ১৯৪৭-এর দেশভাগের মুহূর্ত থেকে পূর্ববাংলা অবশিষ্ট পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যায় অবাঙালিদের হাতে। এমনকি পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সরকারের গভর্নর (ফ্রেডারিক বোর্ন) এবং মুখ্যমন্ত্রী (খাজা নাজিমউদ্দীন) পদে অবাঙালিকে নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা হয়। বাংলাভাষা সংস্কারের নামে পূর্ববাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা হয়। ফলে স্বাধীনতা লাভের দুই বছরের মধ্যেই ভাষা-আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়, সরকারি ছাত্র সংগঠনের পাল্টা আরেকটি ছাত্র সংগঠন (ছাত্রলীগ) জন্মলাভ করে। এসকল প্রতিবাদী কর্মকাণ্ড থেকে উন্মেষ ঘটে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের। দেশভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দল এবং প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাবাসীর নিকট কতটা অপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে। উক্ত নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলমান আসনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু এই বিজয় বাঙালিরা ধরে রাখতে পারেনি। নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতা লাভের দুই মাসের মধ্যেই উক্ত সরকারকে উৎখাত করে এখানে গভর্নরের শাসন জারি করে অবাঙালি ইসকান্দার মীর্জার হাতে শাসনভার দেয়া হয়।

১৯৪৭ থেকেই পূর্ববাংলায় চলতে থাকে উপনিবেশিক শাসন আর শোষণ। প্রতিবাদী বাঙালি নিশ্চুপ থাকেনি। ১৯৪৭ সাল থেকেই এখানে উচ্চারিত হয় স্বায়ত্তশাসনের দাবি। ১৯৪৮-এ প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক যুবলীগ এবং ১৯৪৯-এ প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের মেনিফেস্টোতে স্বায়ত্তশাসন দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার ১৯নং দফায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি করা হয়। কিন্তু পূর্ববাংলার ওপর শোষণ অব্যাহত থাকলে ১৯৬০-এর দশকে শুরু হয় স্বাধিকার আন্দোলন। আওয়ামী লীগের ছয়-দফাভিত্তিক যে-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং তারপর ১৯৬৯-এ যে গণআন্দোলন হয় তা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়।

৫২'র ভাষা আন্দোলন

বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা প্রশ্নে। শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে অগণতান্ত্রিকভাবে ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়। দীর্ঘদিনের বৃটিশ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালি জাতি স্বপ্ন দেখেছিল শোষণহীন একটি রাষ্ট্র করাচিতে। কিন্তু বাঙালির সে স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়, ১৯৪৮ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ করাচিতে গণ পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করেন যে, "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র বিধায় উর্দু হবে এখানকার রাষ্ট্রভাষা।"[৩]

বাঙালিরা তাৎক্ষণিকভাবে এর বিরোধিতা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের শ্লোগান তোলেন। ইতোমধ্যে পূর্বপাকিস্তানের একজন বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন জিন্নাহর প্রতি সমর্থন জানাতে গিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন যে, কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ছাড়া পূর্ব বাংলার কেউ বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলছেন না।

এই বিবৃতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। মার্চের শেষের দিকে জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তান তার প্রথম সফরকালে আবার ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। ১৯৪৮ সালের ২৭শে নভেম্বর লিয়াকত আলী খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় এ প্রসঙ্গটি আবার উত্থাপনের চেষ্টা করলে তা ছাত্রদের আবেগ অনুভূতিতে আরেক দফা ঘা দেয়। জনসভায় এমন প্রবল প্রতিবাদ উঠে যে লিয়াকত আলী খাঁন তার বক্তব্য শেষ করতে পারেনি। এ সময় আয়োজিত ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

ইতোমধ্যে লিয়াকত আলী খানের গুপ্তহত্যার পরে খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি এক জনসভায় ঘোষণা করেন- 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' তাঁর এই ঘোষণা গোটা প্রদেশব্যাপী গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটায়। ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং সেদিন ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

এ অবস্থায় রাজনীতিবিদদের পক্ষে নীরব থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয় এবং সেদিন ফৌজদারী দণ্ড বিধির ১৪৪নং ধারা লঙ্ঘন করা হয়। মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে ছালাম, রফিক, বরকত, শফিউর প্রমুখ আরো অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন। ২২ ফেব্রুয়ারি পরিস্থিতি এক গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

ভাষা আন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িয়ে পড়ে। যেমন কেন্দ্রীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসনসংখ্যা দাবি করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদেরকে অধিকসংখ্যক নিয়োগের

দাবি করা হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। বাংলাভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের বৈরী মনোভাবের কারণে এই দল থেকে গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হওয়ায় পুর্ববাংলায় মুসলিম লীগের প্রাধান্য খর্ব হয়। ফলে ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এই দলের চরম পরাজয় ঘটে।

ভাষা আন্দোলন প্রথম পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিবিদ এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তাচেতনা শুরু হয়। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ভাষা আন্দোলন একধরনের প্রাদেশিকতাবাদের জন্ম দেয়। এরপর যখনই পূর্ববাংলার স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো দাবি উচ্চারণ করা হয়েছে তখনই পূর্ববাংলাবাসীর সমর্থন অর্জন করেছে।

ভাষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। ছাত্ররা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনের মাত্র দুইমাসের মধ্যেই (এপ্রিলে) পূর্ববাংলায় ছাত্র ইউনিয়ন নামে ছাত্রসংগঠন জন্মলাভ করে। পরবর্তী আন্দোলনসমূহে তাই দেখা যায় ছাত্রসমাজই ছিল মূল শক্তি। যে-কোনো সরকারের যে-কোনো অন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারণ করে ছাত্রসমাজ। ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকদের মধ্যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে, পরবর্তী আন্দোলনসমূহে আমরা তার পুনরাবৃত্তি দেখি।[৪]

পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও ২১ দফা

অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। ১৪ আগস্ট ১৯৪৭-এ ঘোষিত "Provincial Legislative Assembly Order, 1947" অনুসারে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই যুক্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১ (২) নং ধারা সংশোধন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচন ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী পরাজিত হওয়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার আর কোনো নির্বাচন মোকাবিলা করতে ভয় পান। ফলশ্রুতিতে নূরুল আমিন সরকারের অনুরোধক্রমে পাকিস্তান গণপরিষদ "The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953" পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের মেয়াদ আরও এক বৎসর বৃদ্ধি করেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৫]

যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নিম্নে ২১ দফার দাবিগুলো উল্লেখ করা হল:

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায় সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প বৃহৎশিল্পে লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসুদপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকলপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য-আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[৬]

পর্যালোচনা

১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যধিক। পূর্ববাংলায় এটি ছিল প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষভোটে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন ছিল অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ। নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১-দফার দাবির সপক্ষে ভোট দিয়ে জনগণ পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে উক্ত দলের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলায় সেই-যে মুসলিম লীগের পতন ঘটল, এরপর আর কখনো এখানে মুসলিম লীগ দল শক্তিশালী হতে পারেনি।[৭]

১৯৫৬ সালের সংবিধান

১৯৫৬ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়। দেশ তখন থেকে গণতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে তার যাত্রা শুরু করে।

১৯৫৬ সলের সংবিধানে উল্লিখিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ ছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রায় অনুরূপ। মূল বিষয়গুলো ক্ষেত্র বিশেষে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে ফেডারেল সরকারের হাতে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল।[৮]

পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন

উচ্চাভিলাষী পাকিস্তানী শাসকগণ বরাবরই গণতান্ত্রিক চর্চার বাইরে বিকল্প উপায়ে ক্ষমতায় আরোহন করার এক ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত থাকত। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০:৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন।[৯] তিনি উক্ত ৭ অক্টোবরের ফরমান বলে পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। একই ফরমান বলে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে

বরখাস্ত করা হয়, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙে দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলসমূহ বিলুপ্ত করা হয়, মৌলিক অধিকারসমূহ কেড়ে নেয়া হয়। ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে উৎখাত করে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন।[১০] ২৮ অক্টোবর আইয়ুব খান এক সরকারি আদেশ জারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন

সামিরক শাসক আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতার ভিত হিসেবে সামরিক আইনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। তিনি সামরিক আইন বলে গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসনব্যবস্থার বিলোপসাধন করেন। সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। আইয়ুব খান তাঁর পূর্বসূরিদের ন্যায় বাংলাভাষা বিদ্বেষী ছিলেন- তাই দুই অঞ্চলের সংহতি রক্ষায় ভাষার সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দিয়ে রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা করেন। তাঁর এ হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়।

আইয়ুব খান অধিকতর মুসলমানিত্ব প্রদর্শনের জন্য কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সংলাপ বদল করার উদ্যোগ নেয়।

আইয়ুব খান রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করে দেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। তিনি ১৯৬১ সালের রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নষ্ট করার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মীদের গ্রেফতার করেন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে যার ফলশ্রুতিতে ছায়ানট শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়।

১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন

এছাড়াও '৬২ তে ছোটখাটো আরও কিছু আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলনকে তরান্বিত করতে সংঘটিত হয়, যেমন-

সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ

পূর্ববাংলার অবিসংবাদিত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হয়।[১১] প্রিয় নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে পূর্বপাকিস্তানে ছাত্ররা ধর্মঘট আহ্বান করে। এ ধর্মঘট ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমান, তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রমুখ রাজনীতিবিদগণ এবং অনেক ছাত্রনেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। এইভাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সামরিক শাসন বিরোধী প্রকাশ্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।[১২]

সংবিধান বিরোধী আন্দোলন

সামরিক আইন চলাকালীন ছাত্ররা আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ১ মার্চ (১৯৬২) পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান ঘোষণা

করা হয় (এবং তা কার্যকরী করা হয় ৮ জুন থেকে)। উক্ত সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের 'দাবি-দাওয়া' চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়। নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়, ভোটাধিকার সংরক্ষিত করে মৌলিক গণতন্ত্রী নামে একটি শ্রেণি সৃষ্টি করা হয়—যারা শাসকগোষ্ঠীর তল্পিবাহক হিসেবে কাজ করবে। উক্ত সংবিধান (যা ব্যক্তি আইয়ুব খান দ্বারা নিজের স্বার্থে প্রণীত) ঘোষিত হওয়ামাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ, সমাবেশ এবং ক্লাস বর্জন শুরু করে।[১৩] সরকারও প্রচণ্ড ছাত্র-দলন শুরু করে। বহু সংখ্যক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রদের ব্যাপক হারে গ্রেফতারের আরেকটি কারণ ছিল। ইতোমধ্যে নতুন সংবিধানের আওতায় সারাদেশে ২৮ এপ্রিল জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হয়েছিল। ছাত্ররা উক্ত নির্বাচন বয়কটের জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানায়।[১৪]

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ সামরিক শাসক আইয়ুব খানের জারি করা শিক্ষা সংস্কারের তীব্র বিরোধিতা করে। যা ইতিহাসে "বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন" নামে পরিচিত। তদানীন্তন শিক্ষাসচিব এস.এম শরীফকে সভাপতি করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।[১৫]

কমিশনের নাম শরীফ কমিশন। কমিশন শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের যে সকল সুপারিশমালা পেশ করে তার মধ্যে অন্যতম ছিল:[১৬]

> তিন বছরের বি.এ. পাস কোর্স পদ্ধতি চালু করা। (এর আগে দুই বছরের বি.এ. পাস কোর্স চালু ছিল)।
>
> স্কুল-কলেজের সংখ্যা সীমিত রাখা, শিক্ষা ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ অভিভাবক এবং বাকি ২০ ভাগ সরকার কর্তৃক বহন করা।
>
> ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করা।

এই কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। তারা 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এই ফোরামের ব্যানারে ছাত্রনেতৃবৃন্দ ঢাকা শহরের অন্যান্য কলেজেও (জগন্নাথ কলেজ, কায়েদে আযম কলেজ, ইডেন কলেজ) প্রতিবাদসভা করে। শীঘ্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ডিগ্রি স্টুডেন্ট ফোরাম' 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরামে' রূপান্তরিত হয়।[১৭] পরবর্তীকালে নেতৃত্ব চলে যায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বের হাতে।

মুনতাসীর মামুন এবং জয়ন্ত কুমার রায় আন্দোলনের নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন:

> ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন মিছিল-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই আগস্ট পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্ররা আহ্বান করে হরতাল... ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্র-জনতা মিলিতভাবে রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বাবুল, বাসকন্ডাক্টর গোলাম মোস্তফা এবং গৃহভৃত্য ওয়াজিউল্লাহ... আহত হয় প্রায়

আড়াইশো জন। যশোর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা শহরেও ব্যাপক প্রতিরোধ হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর নিহত হয় একজন ছাত্র।[১৮]

ছাত্রদের এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাড়া দেননি। তখনো প্রকাশ্য রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল—এটাও সমর্থন না-দেয়ার একটা কারণ হতে পারে। বাষট্টির সেপ্টেম্বরে এই আন্দোলনের সাফল্য এই যে, সরকার শরীফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত রাখেন। এই আন্দোলনের বড় সাফল্য এই যে, ছাত্ররাই পরবর্তীকালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে প্রতি বছর ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস'রূপে পালিত হত এবং আজো ছাত্রসমাজ এ দিবসটি গুরুত্বসহকারে পালন করে।[১৯]

৬৪ এর ছাত্র আন্দোলন

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধঃ ১৯৬৪ সালে একের পর এক অনেকগুলো আন্দোলন হয়। চৌষট্টির প্রথম আন্দোলন ছিল অবাঙালি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারি সরকারের ইঙ্গিতে অবাঙালি মুসলমানেরা ঢাকা শহরে এবং তারপর আশেপাশে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে। ১০ জানুয়ারির এই দাঙ্গা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তা বাঙালি-অবাঙালির দাঙ্গায় পরিণত হয়।[২০]

সমাবর্তন বিরোধী আন্দোলনঃ চৌষট্টিতে ছাত্রদের আরেকটি আন্দোলন গড়ে ওঠে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবকে কেন্দ্র করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনেম খান এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। বাষট্টি সালেই মোনেম খান ছাত্রসমাজের বিরূপতা অর্জন করেন। ঐ বছর তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে ময়মনসিংহ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েই সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি দেশের রাজবন্দিদের দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তাদেরকে যেন মুক্তি দেয়া না হয় তার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। এতে ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হয়। জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার পথে তেজগাঁও বন্দরে ছাত্ররা তাকে লাঞ্ছিত করে। এতে তিনি বরং আইয়ুব খান কর্তৃক পুরস্কৃত হন। তিনি আইয়ুব মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হন। এর অল্পদিন পরেই আইয়ুব খান তাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নর হিসেবে মোনেম খান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানোর জন্য আইয়ুবের একজন বিশ্বস্ত, অনুগত ও প্রভুভক্ত চাকরের ন্যায় দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হয়েই তিনি ছাত্রদের দমনের কাজ শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণের জন্য ড. এম.ও. গণিকে উপাচার্য নিয়োগ করেন। ছাত্রদেরকে দমনের জন্য এন.এস.এফ. (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্রসংঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এন.এস.এফ. এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর মোনেম খানের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে কাজ করছিল। স্বভাবতই তিনি ছাত্রসমাজের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এই মোনেম খান যখন সমাবর্তন উৎসবের আয়োজন করে ছাত্রদেরকে ডিগ্রি প্রদান করতে যান- তখন ছাত্ররা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সমাবর্তন উৎসব প্রথম ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ মার্চ ১৯৬৪ তারিখে। এরপর ২২ মার্চ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের তারিখ।

রাজশাহী উৎসব প্যান্ডেলে ছাত্ররা কালো পতাকা টাঙিয়ে দেয় এবং ডিগ্রি হাতে মোনেম খানের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। ঢাকার সমাবর্তনের দিন মোনেম খান সমাবর্তন প্যান্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র ছাত্ররা আইয়ুব-মোনেম বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। সমাবর্তন উৎসব হল লণ্ডভণ্ড। এর পরিণতিতে এল পুলিশ ও এন.এস.এফ-র সম্মিলিত ছাত্রনির্যাতন।[২১] 'ডিগ্রি প্রত্যাহার, বহিষ্কার, গ্রেপ্তার, হুলিয়াজারি এসব মিলিয়ে এক তাণ্ডব-নৃত্য চলে সারা বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে'।[২২] এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৪শত স্কুল ও ৭৪টি কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ১২শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।[২৩]

রাশেদ খান মেনন এই আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

> এই আন্দালনে আশু কোনো ফল লাভ না হলেও এই প্রক্রিয়া ছাত্র-আন্দোলনকে অনেকখানি বহির্মুখী করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্য ও আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্র-আন্দোলনের চাপ আরও তীব্র হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আইয়ুব-মোনামী এই তাণ্ডব-নৃত্য সামাজিক অন্যান্য শক্তিকেও দ্রুত ঐ একনায়কত্বমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পোলারাইজড হতে সাহায্য করে। এই সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই চৌষট্টির শেষে দিকে জন্ম নেয় সম্মিলিত দল ও তার নেতৃত্বে আন্দোলন।[২৪]

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন

স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমি: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র লড়াই ও বহুবিধ ত্যাগ সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিসংগ্রামী জাতিসমূহের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক নেতৃত্বে সশস্ত্রযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সমকলীন ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। মূলত: এই সংগ্রাম শুধুমাত্র জনগণের ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রাম ছিল না, এটা ছিল গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যা সামরিক একনায়ক তন্ত্রের পদতলে দলিত-মথিত হয়েছিল।[২৫] বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং জাতীয়তাবাদ আন্দোলন ১৯৭১ সালের সশস্ত্রযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক বিচারে এর সূত্রপাত হয়েছিল অনেক পূর্বে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় বাঙালিরাও অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী জনগণ অচিরেই আবিষ্কার করে যে, পাকিস্তানও তাদের জন্য আরেকটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র। তাই কালবিলম্ব না করে জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। মূলত: ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের চূড়ান্ত অধ্যায়। ১৯৬৬ সালেই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত হয় বাঙালির স্বাধিকারের সর্বোচ্চ দাবী ৬ দফা কর্মসূচি। প্রকৃত পক্ষে এই ৬ দফা দাবীই কালক্রমে পরিণত হয় বাঙলার স্বাধীনতার এক দাবীতে।[২৬]

ছয়দফা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সতেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এই প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, তা পাক-ভারত যুদ্ধের পর আরো জোরদার হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর 'কপ' (COP) নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। 'কপ'-এর পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া হয় জাতীয় পরিষদের সভায়। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর, যেমন— ন্যাপ, নেজাম ইসলামী, মুসলিম লীগ, জামায়েত ইসলামী প্রভৃতির নেতৃত্বে ছিলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এন.ডি.এফ.-এর নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।[২৭]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু ঘোষণা দিয়েই শেখ মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয়দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬-৬-১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।[২৮]

ঐতিহাসিক ছয়দফা[২৯]

এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে- কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয়:

'(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি

কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয়:

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যাস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

ছয়দফা সম্পর্কে মুজিবুর রহমানের ব্যাখ্যা

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে ১১-২-৬৬ তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর দলের ছয়দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন।[৩০] তিনি বলেন যে, পাক-ভারত যুদ্ধের পর এটা পরিষ্কার হয়েছে পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে হলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে উভয় অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করলেই যে রাষ্ট্রটি

শক্তিশালী হবে—এমনটি ঠিক নয়। বরং একটি যুক্তরাষ্ট্রের সকল ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করতে পারলেই উক্ত রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে। সুতরাং পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং এর উভয় অংশের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অন্যদলের নেতাদের মনোভাব

আওয়ামী লীগ যে-সময় ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সে-সময় পূর্ব পাকিস্তানের কিছু দল ও নেতা সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করছিলেন। যদিও এসব দল কিংবা নেতা শেখ মুজিব-বিরোধী ছিলেন কিন্তু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তারা উপেক্ষা করতে পারেননি।

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা নূরুল আমিন, যিনি একসময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং যার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়, সেই নূরুল আমিনও বলতে শুরু করেন যে, দেশের অখণ্ডতা ও সংহতি নির্ভর করে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে। তিনি মন্তব্য করেন যে, আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার দিয়ে দেশের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।[৩১]

পূর্ব পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হল দেশের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তার মতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে প্রদান করতে হবে।[৩২]

তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি নেতা (১৯৬৫-৬৯) শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা সম্ভব।[৩৩]

রঙ্গলাল সেন ছয় দফা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :

> It was indeed a movement of petty bourgeois, by the petly bourgeois, and for the petty bourgeois. But in fact, this was the first political movement in East Pakistan which resulted in the killing of industrial workers and urban poor people numbering about 40. More than seven hundred agitators were arrested. The participation of workers demonstrated a radical departure from the traditional tactics. This movement, witnessed raids on police station, looting of arms and violent clashes with the police. The large scale mobilization of workers and poor people, along with students and other sections of the urban society of Dacca in connection with the general stricke on 7 June, 1966 demonstrated the fact that the autonomy mvement had wide popular support.[৩৪]

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

কুচক্রী পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই ষড়যন্ত্রের সাথে আওয়ামী লীগকে জড়ানো হয়। ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত আসামিকদের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে বিক্ষোভ শুরু হয়।

১৯ জুন সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের বিচারকার্য শুরু হয়।[৩৫] বস্তুত: ছয়দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যে আইয়ুব মোনেম চক্র ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনে। এই ষড়যন্ত্রকে আগরতলা ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে যে মামলা দায়ের করেন তার সরকারী নাম ছিল: 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।'[৩৬] শেখ মুজবিুর রহমান আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি লিখিত বক্তব্য আদালতে উপস্থাপন করেন। তিনি এ মামলাকে ইসলামাবাদের ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন-

> কেবল মাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক 'অর্থনৈতিক ও চাকুরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদয়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।'[৩৭]

ছাত্রদের এগারো দফাভিত্তিক আন্দোলন

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন করতে ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপের মধ্যে তখন কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপক সমর্থন ছিল। কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই ঢাকায় ছয়দফা-পন্থী আওয়ামী লীগের বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রকে পার্টির আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। পার্টি ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে জাতীয়করণের এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করে। ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও ভূমি-মালিকানায় সিলিং কত হবে সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। কিন্তু সিলিঙের গুরুত্ব পার্টি স্বীকার করে। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে অনেক

প্রগতিশীল পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের পর পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলো। এই দুই সংগঠন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি' (Students Action Committee) গঠন করে এবং আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করে।[৩৮]

এগারো দফা দাবি (সংক্ষিপ্ত সার)[৩৯]

১. সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। ছাত্র বেতন শতকরা ৫০% হ্রাস করিতে হইবে। হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু করিতে হইবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে।

৩. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা-এই কয়কটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন

থাকিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা-মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করত সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণপ্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি-বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকস্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি; গ্রেফতারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এসময় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা আর আওয়ামী লীগের ছয় দফায় অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ছাত্র নেতৃত্বের হাতে চলে যায়। আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯ - এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে।[৪০] কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। পরে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ-ইপিআর-এর গুলিবর্ষণে বহু হতাহতের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুব সরকার ১ ফেব্রুয়ারি গোল টেবিল

বৈঠকের আহ্বান জানায় এবং বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু প্যারোলে মুক্তিদান প্রত্যাখান করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের অব্যাহত চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিকে মুক্তিদানে বাধ্য করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতার এই সংবর্ধনা সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪১] পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উপর চাপ প্রয়োগ করলেও তারা বঙ্গবন্ধুর দাবী অগ্রাহ্য করে এবং জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন পুনঃ প্রবর্তনের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসনভার ন্যস্ত করেন।

১৯৭০-এর নির্বাচন ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন[৪২] যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জনমনকে আলোড়িত করছে তার একটা সমাধান বের করা।[৪৩] ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'— এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেন।[৪৪] প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আরও কতগুলি বিষয়কে 'স্থিরীকৃত' বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছে:[৪৫]

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা।
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র রক্ষকের ভূমিকা দেয়া।
৫. যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে উক্ত নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal frame work order)-এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন।[৪৬]

নির্বাচন

পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রায় সকল প্রধান দলসমূহ, যেগুলো সে-সময় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হতো—সেগুলো মূলত ছিল আঞ্চলিক। যেমন, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো সমর্থন ছিল না। অনুরূপ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনসমর্থন ছিল সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ে, অন্যত্র তার সমর্থন ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে যে-দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হচ্ছে : আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসিলম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামাত-ই-ইসলামি প্রভৃতি।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারভিযান শুরু হয়।[৪৭]

পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে দলভিত্তিক প্রার্থীসংখ্যা: ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসনসংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সাধারণ ১৬২ এবং মহিলা ৭টি। ১৬২ টি আসনের জন্য দলভিত্তিক প্রার্থীসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :[৪৮]

দল	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থীসংখ্যা
আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬২
মুসিলম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	৯৩
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	বাঘ	৬৫
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৫০
জামাত-ই-ইসলামি	দাঁড়িপাল্লা	৬৯
জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামি	বই	৪৫
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ	১৩
শর্ষিনার পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দল	গাভী	৫
পাকিস্তান দরদী সংঘ	গরুর গাড়ি	১
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	হুঁকা	.৩
ন্যাপ (ভাসানী)	ধানের শীষ	১৫
ন্যাপ (মোজাফফর)	কুঁড়েঘর	৩৬
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল	১৩
বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার	১
পিডিপি	ছাতা	৮১
জাতীয় গণমুক্তি দল (সংখ্যালঘু)	মোমবাতি	৪
জাতীয় কংগ্রেস (সংখ্যালঘু)	কলম	৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী		১০৯
	মোট	**৭৬৯ জন**

উপরের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এক আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য আর কোনো দলই পূর্ব পাকিস্তানে সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগ সবকয়টি আসনে প্রার্থী দিতে না পারলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল।[৪৯]

১৯৭০ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সাইক্লোন ও নির্বাচনে তার প্রভাব[৫০]

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার জন্য ভোটারদের ভোট দানে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় অনুষ্ঠিত এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবন কেড়ে নেয়। অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন:[৫১]

> If the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the million who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny. (Morning News, Nov. 27, 1970).

এই ঘূর্ণিঝড় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাব নতুন করে প্রমাণ করে। শেখ মুজিবুর রহমান এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। তিনি দুর্গতদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করে বলেন :[৫২]

> A massive rescues and relief operation, if launched within 24 hours of the occurrence, could have saved thousands of lives. Thousand of survivors could have been saved from death due to starvation, exposure and lack of medical attention. Had the navy rushed into the area it could have rescued thousand who had been swept into the sea. The failure to launch such a relief and rescues operation is unforgivable. We are confirmed today in our conviction that if we are to save the people of Bangladesh from the ravages on nature, as of their fellowmen we must attain full, regional autonomy on the basis of the 6-point/11 point formula.

নির্বাচনের ফলাফল

১. জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল প্রদেশ এবং দলভিত্তিক নিম্নরূপ :[৫৩]

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট মহিলা সহ
		পূর্ব পাক	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প.সী.প্র	বেলু-চিস্তান	উপজাতি এলাকা	মহিলা	
আওয়ালী লীগ	১৬২	১৬০	×	×	×	×	×	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	×	৬৪	১৮	১	×	×	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	×	১	১	৭	×	×	×	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	×	৭	×	×	×	×	×	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	×	×	×	৬	১	×	×	৭
মারকাষ-ই-জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	?	×	৪	৩	×	×	×	×	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	×	×	×	৩	৩	×	১	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	×	১	২	১	×	×	×	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	×	২	×	×	×	×	×	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	×	×	×	×	×	×	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৩	×	×	৭	×	১৪
মোট		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নূরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। ১০দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।[৫৪]

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল[৫৫]

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ালী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	×	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	×	×	×
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	×	১
জামায়াতে ইসলামি	১	×	১
নেজামে ইসলামি	১	×	১
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	×	×	×
মারকাজে আহলে হাদীস	×	×	×
জামায়াত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	×	×	×
জামায়াত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	×	×	×
স্বতন্ত্র পার্থী	৭		৭
মোট	**৩০০**	**১০**	**৩১০**

২. সংগঠনের দিক থেকে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি—উভয়েই ছিল আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

৩. দুই প্রদেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করায় পাকিস্তানে নির্বাচনোত্তর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে।[৫৬] নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়া পর শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন:

> I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our Six-point Programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitution except one which is based on the Six-point Programme.[৫৭]

নির্বাচনী ফলাফলের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ও ভুট্টোর পি.পি.পি.-এর প্রতিক্রিয়া

শেখ মুজিবের বিবৃতির পাল্টা জবাবে ভুট্টো বলেন, তার দলের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন যে, পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এক দুই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব অবশ্য থাকতে হবে।[৫৮] ভুট্টোর কথার পাল্টা জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সংবিধান প্রণয়ন করতেও সে সক্ষম। তিনি বলেন যে, যেহেতু 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক—ভুট্টোর এই দাবি ঠিক নয়।[৫৯] ভুট্টো বলেন যে, জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ভুট্টো দাবি করেন যে, নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত আইনকাঠামো আদেশে ক্ষমতার বণ্টন সম্পর্কে যা উল্লিখিত আছে তারই আলোকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত আদেশে বলা হয়েছিল:[৬০]

> আইন তৈরি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সবরকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকারও বাইরের ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।

এইভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ছয়দফার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। অপরদিকে পিপিপিসহ অন্যান্য ডানপন্থী দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দের শপথ

গ্রহণ উপলক্ষে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক র‍্যালি সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন:[৬১]

> সংবিধান প্রণয়ন করতে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতা চাই। কিন্তু মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই। ...আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করছি, অবিচার সহ্য করছি। এর কী জ্বালা তা আমরা বুঝি। সুতরাং আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায়বিচার করব।

সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে আপস প্রচেষ্টা

১৯৭১ সালের মধ্য-জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এসে তিনদিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে ছয়দফার কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফাদ্বয় মেনে নিতে সম্মত হন। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে ৩ মার্চ, ১৯৭১। ভুট্টো তার মতামত গ্রহণের অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। তিনি বলেন যে, তার দল কেবলমাত্র অন্য একটি দল কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত একটি সংবিধানে সম্মতি দেয়ার জন্য ঢাকা যেতে পারে না।[৬২]

ভুট্টোর এই বক্তব্য বেশ সমালোচিত হয়। পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট অত্যাসন্ন বলে সংবাদপত্রগুলোতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন: 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কর্মসূচি পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন।'[৬৩] কিন্তু ইয়াহিয়া ভুট্টোর দাবির নিকট মাথা নত করেন। তিনি ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় বলেন:[৬৪]

> সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্থান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সেজন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদ

ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষেভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন :

> এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বাঙালির পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে—গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না-করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া।[৬৫]

২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। প্রদেশটির যোগাযোগ সারাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো কোনে ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐদিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিতে ছিল: ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা।[৬৬] ৩ মার্চ শেখ মুজিব ছাত্রলীগ আয়োজিত এক জনসভায় তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না-হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন।[৬৭] এমনি অবস্থায় প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করার উদ্দেশে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আহ্বান জানান।[৬৮] আওয়ামী লীগ ঐ ধরনের বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।[৬৯] শেখ মুজিব ছাড়াও নূরুল আমিনসহ জামায়াতে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ), কনভেনশন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অনেকগুলো দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করায় প্রস্তাবিত এই বৈঠক বাতিল করে দেয়া হয়।[৭০] অগত্যা ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ২৫ মার্চ (১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট বলেন :[৭১]

> আমি এ-কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পরে কী ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি বজায় রাখব। এ ব্যাপারে কেউ যেন কোনো সন্দেহ কিংবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশ করব না।

৬ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, আলোচনার অন্তরালে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করেন। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সংস্থা পি.আই.এ-তে করে বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হয়।[৭২] সিনিয়র আর্মি অফিসার ও বড় বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। নগদ টাকাও ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছিল।[৭৩] শেখ মুজিবকে আরো জানানো হয় যে, সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গোপন অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করছে।[৭৪] পাকবাহিনীর এই প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবের উপর চারদিকে থেকে এককভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈন্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ সকলেই মুজিবকে গোপনে জানান যে, এ ধরনের ঘোষণা দিলে তারা মুজিবকে সমর্থন দেবেন।[৭৫]

এমনি প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ (যা 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের' ভাষণ নামে অভিহিত হয়েছে) দেন।[৭৬]

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া[৭৭]

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করার কারণে এবং ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কড়া সমালোচনা করেন।

জামায়াতে ইসলামির ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ ভুট্টোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সরকার গঠন অবাস্তব এবং তা আইনকাঠামো আদেশের পরিপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে চারটি প্রদেশ সৃষ্টি হলেও ভুট্টো অন্যায়ভাবে এক ইউনিটের কথা বলছেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আলী আসগর শাহ বলেন যে, ভুট্টো ক্ষমতা পাবার লোভেই কেবল দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দুই সরকারের কথা বলছেন। অথচ পাকিস্তান কীভাবে রক্ষা পাবে সেই চেষ্টাই তার করা উচিত ছিল।

এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি জানান।

ওয়ালী ন্যাপের ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করাকে অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেন। ওয়ালী ন্যাপ ৪ মার্চ কোয়েটায় হরতাল পালন করে।

পি.ডি.পি. নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মুজিবের দাবিগুলি ন্যায়সংগত বলে মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

১৪ মার্চ (১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে এ যাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বাতিল করে দেন। তদস্থলে ১৫ মার্চ থেকে নির্দেশ আকারে ঘোষিত ৩৫টি কার্যসূচি শুরু হবে বলে নির্দেশ দেন।[৭৮]

সর্বশেষ সমঝোতা অভিনয় : ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন

১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা করা। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক করেন। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এসময় পরিপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র রচনার চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়।[৭৯] ইয়াহিয়া খান দুই প্রদেশের দুই নেতা—ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে আপস মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ভুট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। তাছাড়া পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য পাঞ্জাব থেকে আগত। পাঞ্জাবিরা কিছুতেই ছয়দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগও ছয়দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।[৮০] এমতাবস্থায় ভুট্টো ও

ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় কালক্ষেপণ করে অলক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা-সদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করেছিল। প্রসঙ্গত সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:[৮১]

> ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে যে সমঝোতাই হউক না কেন, বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী তাদের সবরকম যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত করে যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এম.ভি. সোয়াত নামের জাহাজ ৩রা মার্চ থেকেই চট্টগ্রামে নোঙ্গরের অপেক্ষায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। পি.আই.এ. বিমানযোগে আরো ঘন ঘন ফ্লাইট-এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোশাকে সৈন্য আমদানি করা হচ্ছিল। সৈন্য এবং যুদ্ধোপকরণ বহনকারী সি-১৩০৬ বিমানগুলো অবতরণ করছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছিল ভারী কামান ও মেশিনগান। পাকিস্তানের সুকৌশলী এস.এম.জি. কমান্ডো গ্রুপের ঢাকা আগমনের তথ্যও ঢাকার সাংবাদিকদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। মুজিব এবং ইয়াহিয়া যেখানে দেনদরবার চালাচ্ছিলেন সেই গণভবনের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হচ্ছিল ট্যাংক বহর। অন্যদিকে যত্রতত্র জনতার উপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরো অবনতির দিকে।

অবশেষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইতিহাসের বর্বরতম নরহত্যা সংগঠিত করে। পাকিস্তানবাহিনী তাদের এই পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ (১৯৭১) স্বাধীনতার ঘোষণা দিত।[৮২] তাদেরকে এই কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনী নামাতে হয়। কিন্তু এর ফল হয় উল্টো। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাক-সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেখানে সিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বিদেশী পত্রপত্রিকায় তাঁর বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল।[৮৩]

২৫ মার্চ রাত ১২টার আগে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ঢাকার পিলখানার ইপিআর হেড কোয়াটার এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালিয়ে বাংলায় গণহত্যা শুরু করে, ঢাকা শহরে আগুন লাগিয়ে পোড়াতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে রাত ১২টার পরে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর শুরুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী ছেড়ে দেবার পর মুহূর্তেই হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে।[৮৪]

পাক-সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে নয় মাস। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে।[৮৫] এভাবেই সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উপসংহার

স্বাধীনতার অমিয় স্বাদ আস্বাদনের জন্য যে ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা দরকার বাঙালি জাতি তা বিন্দুমাত্র কম করেনি। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে কোন জাতিকে স্বাধীনতার জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে দেখা যায় না। বাঙালির হাজার বছরের প্রবহমান ধারায় ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সুদীর্ঘপথ অতিক্রমের পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি সারা বিশ্বের নিকট একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র লড়াই, তিরিশ লাখ শহীদের রক্তদান, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী-শুধু এই অঞ্চলের নয়, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা তথা সমগ্র পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী, মুক্তিসংগ্রামী, নিপীড়িত জাতিসমূহের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত।[৮৬]

তথ্যসূচি:

---

১ মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ১০

২ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*: দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৭০ (এরপর স্বাধীনতা দলিলপত্র লিখিত হইবে)

৩ মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা: ইউনিভর্সিটি প্রেস লি:, ১৯৯২), পৃ. ২৪

৪ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

৫ *তদেব*, পৃ. ১০২

৬ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: প্রথম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

৭ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

৮ মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

৯ S.A. Akanda, *The working of the Ayub Constitution and the people of Bangladesh*, The Journal of the Institution of Bangladesh Studies, Vol. IV (1979-80), p. 83

১০ S.A. Akanda, *op.cit.*, p. 84

১১ মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫), পৃ. ২৪

১২ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

১৩ কাজী জাফর আহমেদ, '*বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন*', বিচিত্রা, নাফ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর

১৪ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫

১৫ সদস্য তালিকা দ্রষ্টব্য, দৈনিক আজাদ, ২৮ মে, ১৯৬৪

১৬ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (করাচী, শিক্ষামন্ত্রণালয়, পাকিস্তান সরকার, ১৯৬১)

১৭ কাজী জাফর আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১৮ মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

১৯ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

২০ *তদেব*, পৃ. ১৬৬-১৬৭

২১ *তদেব*, পৃ. ১৬৭-১৬৮

২২ রাশেদ খান মেনন, *চৌষট্টির ছাত্র আন্দোলন*, বিচিত্রা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭, পৃ. ৫৪
২৩ আজাদ, ২৮ মে, ১৯৬৪
২৪ রাশেদ খান মেনন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪
২৫ A.F. Salahuddin Ahmed, *Bangladesh Tradition and Transformation* (Dhaka: University Press Ltd. 1987), p. 79
২৬ মো. শাহজাহান, *বাংলাদেশের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা (১৯৬৬-১৯৭১): একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ);* পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য রা:বি:-এ দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ, পৃ. ৪৭২-৪৭৩
২৭ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
২৮ আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৬৬), পৃ. ১৩০-১৫১
২৯ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬৯
৩০ দৈনিক ইত্তেফাক, ১২.২.১৯৬৬
৩১ The Pakistan Observer, 20.12.1967
৩২ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩.৬.১৯৬৫
৩৩ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮.৬.১৯৬৫
৩৪ Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1986), p. 214
৩৫ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:), পৃ. ২৯৬
৩৬ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩
৩৭ *তদেব*, পৃ. ৩৫৯
৩৮ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২
৩৯ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৫-৪০৮
৪০ পাতিস্তান সরকার, পূর্ব-পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র (৫ আগস্ট, ১৯৭১), পৃ. ১
৪১ শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, তদেব, পৃ. ২৯৬
৪২ *তদেব*, পৃ. ৪৮০-৪৮৪
৪৩ পাকিস্তান সরকার, পূর্বপাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র (৫ আগস্ট, ১৯৭১), পৃ. ১
৪৪ ঐ, পৃ. ১
৪৫ ঐ, পৃ. ২
৪৬ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১
৪৭ *তদেব*, পৃ. ২১৬
৪৮ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭০
৪৯ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২২১
৫০ G. Morshed, "Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh: A Political Analysis", The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. XI, (1988), pp. 109-110
৫১ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩
৫২ Golam Morshed, *op.cit.*, p. 116
৫৩ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৬
৫৪ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪
৫৫ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৬
৫৬ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫-২২৬
৫৭ Golam Morshed, *op.cit.*, p. 120
৫৮ *Ibid*, p. 120
৫৯ *Ibid*
৬০ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৬১ Golam Morshed, *op.cit.*, p. 121
৬২ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
৬৩ ঐ
৬৪ ঐ, পৃ. ১১; স্বাধীনতার দলিল পত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৯-৬৬০
৬৫ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১; স্বাধীনতার দলিলপত্র ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬১-৬৬২
৬৬ ঐ, পৃ. ৬৭১-৬৭৪
৬৭ ঐ
৬৮ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২
৬৯ ঐ, পৃ. ১১-১২
৭০ মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫
৭১ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
৭২ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩
৭৩ ঐ
৭৪ ঐ
৭৫ ঐ, পৃ. ১৮৬
৭৬ ঐ, পৃ. ৭০০-৭০২
৭৭ ঐ, পৃ. ৭৪৯-৭৫২
৭৮ ঐ, পৃ. ৭৩৮-৭৪৬
৭৯ মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪
৮০ স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮০
৮১ মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১
৮২ শ্বেতপত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
৮৩ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫-২৩৬
৮৪ ইমন সরকার, *স্বাধীনতার ঘোষক কে* (ঢাকা: তরফদার প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ২৯
৮৫ ড. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৯৪৭-৭১ শীর্ষক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত
৮৬ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১), প্রফেসর সালাহ উদ্দীন আহমদ, মোনায়েম সরকার, ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জুর সম্পাদিত (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ১৭।